প্রোফেসর শঙ্কু

প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক-রহস্য

সত্যজিৎ রায়

৭ই এপ্রিল

অবিনাশবাবু আজ সকালে এসেছিলেন। আমাকে বৈঠকখানায় খবরের কাগজ হাতে বসে থাকতে দেখে বললেন, ব্যাপার কী? শরীর খারাপ নাকি? সকালবেলা। এইভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

আমি বললুম, এর আগে কখনও এইভাবে বসে থাকিনি তাই দেখেননি।

কিন্তু কারণটা কী?

একটা নতুন যন্ত্র নিয়ে প্রায় দেড় বছর একটানা কাজ করে কাল সকালে সেটার কাজ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। তাই ঠিক করেছি। সাত দিন বিশ্রাম নেব।

অবিনাশবাবু একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে মাথা নেড়ে বললেন, আপনাকে পইপই করে বলছি। এবার রিটায়ার করুন। আরো মশাই, বিজ্ঞানেরও তো একটা শেষ আছে–নাকি মানুষ অনাদি অনন্তকাল ধরে একটার পর একটা নতুন গবেষণা চালিয়েই যাবে?

আমি একটু হেসে বললাম, আমার তো তাই বিশ্বাস। মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নেই।

মানুষের না থাকলেও, আপনার জিজ্ঞাসার অন্তত সাময়িক বিরতি আছে দেখে খুশি হলুম। চলুন, বেড়িয়ে আসি।

কাজের সময় অবিনাশবাবু এসে পড়লে রীতিমতো ব্যাঘাত হয়। অযথা আজেবাজে প্রশ্ন করেন, টিটকিরি দেন, আর আমার সূক্ষ্ম গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কাজগুলো পণ্ড করার নানান ছেলেমানুষি চেষ্টা করেন। এতে যে উনি কী আনন্দ পান তা জানি না। তবে ভদ্রলোক আমার প্রায় পাঁচিশ বছরের প্রতিবেশী, তাই সবই সহ্য করি।

আজ যখন হাত খালি, তখন কিন্তু অবিনাশবাবুর সঙ্গটা খারাপ নাও লাগতে পারে। হাজার হোক, রসিক লোক। আর আমাকে ঠাট্টা করলেও আমার অমঙ্গল কামনা করেন এমন কখনই মনে হয়নি। তাই অবিনাশবাবুর প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

গিরিডিতে বেড়াবার কথা বললে উশ্রীর ধারটাই মনে হয়, কিন্তু অবিনাশবাবু দেখি চলেছেন উলটো দিকে অর্থাৎ তাঁর বাড়ির দিকে। ব্যাপার কী? কী মতলব ভদ্রলোকের?

কিছুদূর যাবার পরে অবিনাশবাবু নিজেই কারণটা বললেন—আজ একটা খেলনা পেয়েছি। সেটা আপনাকে দেখাব।

খেলনা?

চলুন না। দেখলে আপনারও লোভ লাগবে।-কিন্তু আপনাকে দেব না সেটি।

মনে মনে বললাম—খেলনার বয়স আপনার হয়তো থাকতে পারে—কিন্তু আমার কি আর আছে?

অবিনাশবাবু তাঁর বাড়িতে পৌছে সোজা নিয়ে গেলেন তাঁর বৈঠকখানায়। সেখানে দেখুন।

আলমারির উপরের তাকে দেখি অনেক রকম গ্রাম্য খেলনা সাজানো রয়েছে—কেষ্টনগরের মাটির পুতুল, পোড়ামাটি ও চিনেমাটির জন্তু জানোয়ার, শোলার গাছ ও পাখি, কাশীর বাঘ ও আরও কত কী। আর এসবের মাঝখানে রয়েছে একটি মসৃণ বল। অবিনাশবাবুর আঙুল সেই বলের দিকেই পয়েন্ট করেছে।

কেমন লাগছে আমার বলটা?

বলের মতোই মসৃণ গোল জিনিসটা–তবে সেটা যে কীসের তৈরি তা বোঝা মুশকিল। আর তার রংটা বর্ণনা করা বেশ কঠিন। কিছুটা মেটে, কিছুটা সবুজ, কিছুটা আবার হলদে। আর লাল মেশানো একটা পাঁচমিশালি রং বলা যেতে পারে। বেশ মজা লাগল দেখতে বলটাকে।

আমার ইন্টারেস্ট দেখে অবিনাশবাবুর যেন বেশ খুশি খুশি ভাব হয়েছে বলে মনে হল।

জিজ্ঞেস করলাম, এ কোথায় তৈরি? কোত্থেকে পেলেন?

অবিনাশবাবু বললেন, প্রথমটির উত্তর জানা নেই। দ্বিতীয়টি খুব সহজ। কাল উশ্রীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখি বালির ওপর একটা জলঢোঁড়া সাপ মরে পড়ে আছে। সাপটকে দেখছিলুম, হাতখানেক দূরেই যে বলটা পড়ে আছে সেটা প্রথমে লক্ষ করিনি। যখন করলুম, তখন এত ভাল লাগল যে তুলে নিয়ে এলুম। একবার হাতে নিয়ে দেখবেন? ওজন আছেত বেশ।

অবিনাশবাবু খুব সাবধানে তাক থেকে বলটা নামিয়ে আমার হাতে দিলেন। সত্যিই বেশ ভারী। আর রীতিমতো ঠাণ্ডা। সাইজে একটা টেনিস বলের দ্বিগুণ। কিন্তু হাতে নিয়েও বুঝতে পারলাম না সেটা কীসের তৈরি। মাটির ভাগ হয়তো কিছুটা আছে–কিন্তু তার সঙ্গে বোধ হয় আরও কিছু মেশানো আছে।

কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে বলটা ফেরত দিয়ে বললুম, বেশ ইন্টারেস্টিং জিনিস।

অবিনাশবাবু আলমারির ভেতর বলটা রাখতে রাখতে বললেন, হুঁহ! তা হলে স্বীকার করুন যে আপনি ছাড়া অন্য লোকের কাছেও আশ্চর্য জিনিস থাকতে পারে। যাকগে, এবার চলুন সত্যিই একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বেশ মেঘলা মেঘলা দিনটা করছে।

ঘণ্টা দু-এক পরে বাড়িতে ফিরে এসে আর একবার আমার নতুন যন্ত্রটাকে দেখে এলাম। এ যন্ত্র সম্বন্ধে বাইরে জানাজানি হলে আবার নতুন করে যে সম্মান পাব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি—মাইক্রোসোনোগ্রাফ। প্রকৃতির সব সূক্ষাতিসূক্ষ্ম শব্দ, যা মানুষের কানে আজ অবধি কখনও শোনা যায়নি এমনকী যার অনেক শব্দের অস্তিত্বই মানুষে জানত না-সেই সব শব্দ এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার শোনা যায়।

কাল পিঁপড়ের ডাক শুনেছি। এই যন্ত্রে। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। কতকটা ঝিঁঝির ডাকের মতন, তবে ওরকম একটানা একঘেয়ে নয়। অদ্ভুত বিচিত্র সুরের ওঠানামা, স্বরের তারতম্য—সব কিছুই আছে ওই পিঁপড়ের ডাকে। আমার তো মনে হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতে আমি পিঁপড়ের ভাষাও বুঝতে পারব। আর শুধু পিঁপড়ে কেন? এতে প্রকৃতির এমন কোনও সূক্ষ্ম শব্দ নেই। যা শোনা যায় না। একটা knob আছে, সেইটে ঘুরিয়ে এর ওয়েভলেংথ পরিবর্তন করা যায়। এবং এই ঘোরানোর ফলেই বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত আওয়াজগুলো ধরা পড়তে থাকে!

আমি বাড়ি ফিরে এসে একটা বিশেষ ওয়েভলেংথে knob-টা সেট করে, আমার বারান্দার টবের গোলাপগাছের একটা ফুল ছিড়তেই অতি তীক্ষ্ণ বেহালার স্বরের মতো একটা আর্তনাদ আমার যন্ত্রটায় ধরা পড়ল। এটা যে ওই গাছেরই যন্ত্রণার শব্দ সেটা ভাবতেও অবাক লাগে।

অবিনাশবাবু আমাকে তাঁর বল দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন। আমার যন্ত্রটার বাহাদুরির দু-একটা নমুনা দেখলে না জানি তাঁর মনের অবস্থা কী হবে!

১২ই এপ্রিল

www.bengaliebook.com

আজ সকালে আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফটা দেখানোর জন্য অবিনাশবাবুর কাছে আমার চাকর প্রহ্লাদকে পাঠাব ভাবছিলাম—এমন সময় দেখি ভদ্রলোক নিজেই এসে হাজির।

তাঁর চোখমুখের ভাব এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের রকম দেখে মনে হল তিনি বেশ উত্তেজিত। আমি তখন যন্ত্রটা আমার বাগানের ঘাসের ওয়েভলেংথের সঙ্গে মিলিয়ে আমার মালির ঘাস কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের সমবেত চিৎকার শুনছি। অবিনাশবাবু আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকে হাতের লাঠিটা দড়াম করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে টিনের চেয়ারটায় ধাপ করে বসে পড়লেন। তারপর একটা বড় নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট করছেন—আর এদিকে আমার বাড়িতে যে তাজব কাণ্ড চলেছে।

অবিনাশবাবুর তাচ্ছিল্যের সুরটা মোটেই ভাল লাগল না। গলার স্বরটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, কী কাণ্ড?

শুনবেন কী কাণ্ড? আমার সেই বল-মনে আছে?

আছে।

কেবল ঘণ্টায় ঘণ্টায় রং বদলাচ্ছে।

কী রকম?

এত ধীরে বদলাচ্ছে, যে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু আপনি যদি এখন দেখে আবার দু ঘণ্টা বাদে গিয়ে দেখেন, তা হলে চেঞ্জটা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। আমি তো নাওয়াখাওয়া ভুলে গিয়ে কদিন থেকে এই করছি।

এখন কী রকম দেখলেন?

www.bengaliebook.com

এখন তো সকাল। সকালের চেহারা সেদিনের সকালের চেহারার মতোই। এখন যদি দেখেন তো সেদিনের মতোই দেখবেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে গেলে দেখবেন একেবারে অন্যরকম। সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার শুরু হয় সন্ধে থেকে। কী রকম একটা সাদা সাদা ছোপ পড়তে থাকে। পরে মাঝরাত্তিরে যদি দেখেন তো দেখবেন একেবারে ধপধাপে সাদা। যেন একটা জায়ান্ট সাইজ ন্যাফথ্যালিনের বল।

ভারী আশ্চর্য তো।

ভাবছি। খবরের কাগজে একটা খবর পাঠিয়ে দিই। তবু এই গোলক রহস্যের জোরে যদি কিছুটা খ্যাতি হয়। জীবনে তো কিছুই হল না। চাইকী, জাদুঘরের জন্য গভর্নমেন্টকে বেচে যদি দুপিয়সা করে নেওয়া যায়, তাই বা মন্দ কী?

অবিনাশবাবুর কথা শুনে বুঝলাম তিনি আকাশকুসুম দেখছেন। মুখে বললাম, এসব করার আগে একবার জিনিসটা নিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখলে হত না? হয়তো দেখবেন চোখের ধাঁধা কিংবা আপনার দেখার ভুল।

অবিনাশবাবু এবার যেন রীতিমতো রেগে উঠলেন। তাড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে লাঠিটা বগলদাবা করে নিয়ে বললেন, ভুল তো ভুল। আপনি থাকুন আপনার হাতুড়ে কারবার নিয়ে। আমি দেখি আমার বলের দৌলত কতখানি।

এর প্রত্যুত্তরে আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ভদ্রলোক হনহানিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিকেলের দিকে অনুভব করলাম যে বলটা সম্পর্কে আমারও মনের কোণে কেমন যেন একটা কৌতুহল উঁকি দিচ্ছে।

আমার যন্ত্রটা তখন একটু গণ্ডগোল করছে।-বোধ হয়। ভিতরে কোনও কনট্যাক্টের গোলমাল হয়ে থাকবে। সেটাকে পরে শোধরাব স্থির করে অবিনাশবাবুর বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দেখি ভদ্রলোক তাঁর বৈঠকখানার টেবিলের উপর বুকে পড়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটা চিঠি লিখছেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন–দেখুন তো মশাই ভাষাটা কেমন হয়েছে। এটা আনন্দবাজারকে লিখেছি। –সবিনয় নিবেদন, আমি সম্প্রতি একটি আশ্চর্য গোলক সংগ্রহ করিয়াছি। যাহার তুল্য বস্তু পৃথিবীতে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। গোলকটির একাধিক বিস্ময়কর গুণ আছে। যথা, ইহা কোন পদার্থের সংমিশ্রণে নির্মিত তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব (স্থানীয় বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বরবাবু মহাশয়ও এ ব্যাপারে আমার সহিত একমত)। গোলকটির দ্বিতীয় গুণ-ইহার বর্ণ। আপনা হইতেই প্রহরে প্রহরে পরিবর্তিত হয়। তৃতীয়ত-কেমন হচ্ছে?

বেশ তো। তৃতীয় গুণটি কী?

ওইটেই এখন লিখছি। সেটা হল-মাঝে মাঝে বলটাকে ধরলে কেমন ভিজে ভিজে মনে হয়। এখন দেখলেই বুঝতে পারবেন।

অবিনাশবাবু চিঠি লেখা বন্ধ করে আমাকে তাঁর আলমারির কাছে নিয়ে গেলেন। এবারে দেখলাম ভদ্রলোককে চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলতে হল। খুলে বললেন, হাত দিয়ে দেখুন, ভিজে টের পাবেন। আর ওই দেখুন কেমন সাদার ছোপ ধরতে আরম্ভ হয়েছে।

আমি ডান হাতটা বাড়িয়ে বলটা ছুতেই আমার শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। আসলে আর কিছুই না-দেখলাম যে বলটা শুধু ভিজে নয় একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা।

অবিনাশবাবু বললেন, সেদিনের চেয়ে তফাত দেখলেন তো? এবার বলি কী, কিছুক্ষণ আরও থেকে অন্তত আরও কিছুটা পরিবর্তন দেখে যান। আমি ভেতরে বলে দিচ্ছি–আপনার রাত্রের খাওয়াটা এখানেই সরুন, কেমন?

গোলকের রূপান্তর দেখে সত্যিই আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। তাই অবিনাশবাবু অনুরোধ না করলে আমি নিজেই হয়তো আরও কিছুক্ষণ থেকে যাওয়ার প্রস্তাব করতাম।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে বলের রং-পরিবর্তন স্টাডি করে এই কিছুক্ষণ হল বাড়ি ফিরেছি। অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছি তখন রাত সাড়ে এগারোটা। বলের চেহারা তখন সত্যিই একটা অতিকায় ন্যাফথালিনের গোলার মতো। আমার ইচ্ছে ছিল বলটাকে অন্তত একবার একদিনের জন্য আমার কাছে এনে সেটাকে নিয়ে একটু গবেষণা করি– কিন্তু অবিনাশবাবু নাছোড়বান্দা। আমার উপর টেক্কা দেওয়ার সুযোগ কি সহজে ছাড়েন। তিনি! তাঁর বিশ্বাস-গিরিডিতে আমিও থাকি, তিনিও থাকেন; অথচ আমারই কেবল জগৎজোড়া নামডাক হবে, আর তিনি অখ্যাত থেকে যাবেন-এটা ভারী অন্যায়।

কাল একবার দুপুরের দিকে বলের চেহারাটা দেখে আসতে হবে।

১৩ই এপ্রিল

আজ অবিনাশবাবু একটি গামছায় মুড়ে বলটাকে আমার কাছে দিয়ে গেছেন। আপাতত সেটা আমারই ল্যাবরেটরিতে একটা টেবিলের উপর কাচের ছাউনির তলায় সযত্নে রাখা হয়েছে। সারাদিন ধরে প্রাণ ভরে এর রং পরিবর্তন লক্ষ করছি।

অবিশ্যি অবিনাশবাবু এলেন নাটকীয় ভাবেই। তিনি যখন গামছার পুঁটলি হাতে আমার বৈঠকখানায় ঢুকলেন, তখন তাঁর মধ্যে গতকালের উৎফুল্লতার লেশমাত্র ছিল না। বরং যে ভাবটা ছিল সেটা তার বিপরীত। যেন তিনি একটা অন্যায় করে ফেলেছেন এবং তার জন্য তাঁকে একটা বিশেষরকম মানসিক ক্লেশ ও অশান্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

আমি তখন সবে কফি খাওয়া শেষ করছি। অবিনাশবাবু ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর বলাসমেত গামছাটি রেখে ধুতির খুঁট কপালের ঘাম মুছে বলছেন, না মশাই, আমাদের

এসব জিনিস হ্যান্ডল করা পোষায় না। এ রইল আপনার কাছে। কলকাতা থেকে সাংবাদিক এলে আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেব।

আমি বেশ একটু অবাক হয়ে বললাম, কী হল? এক রাতের মধ্যে এমন কী হল যে এত সাধের বলের উপর একেবারে বিতৃষ্ণা এসে গেল?

আর বলবেন না মশাই! এ বল অতি সাংঘাতিক বল-একেবারে শয়তান বল। জানেন, আলমারিটার মাথার উপর একটা টিকটিকি ছিল–সকালে দেখি মরে আছে। শুধু তাই নয়-আলমারির ভেতর থেকে ডজন খানেক মরা আরশোলা বেরিয়েছে।

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, বিনি। পয়সায় এমন একটা ইনসেকটিসাইড পেয়ে গেলেন, আর আপনি তাই নিয়ে আফশোষ করছেন??

আরো মশাই, শুধু ইনসেকট হলে তো কথাই ছিল না। আমার নিজেরই যে কেমন জানি গা গুলোনো ভাব হচ্ছে।

দিন রাত জেগে বলটার রং বদলানো লক্ষ করছিলেন না?

তা করেছি।

তার মানেই ঘুমের অভাব হয়েছে।–তাই নয় কি?

তা হয়েছে।

তবে? গা গুলোনোর কারণ তো পরিষ্কার।

কী জানি মশাই। হতে পারে। কিন্তু তাও বলছি-এ বল আপনার কাছেই থাক। কেমন জানি উৎসাহ চলে গেছে-বুঝছেন না?

আমি মনে মনে যা বুঝলাম তা হল এইঃ-অবিনাশবাবু তো বিজ্ঞান মানেন না-তিনি যেটা মানেন সেটা হল কুসংস্কার। বলটার কাছাকাছি কটা পোকামাকড় মরতে দেখেই তাঁর ধারণা হয়েছে যে বলটার মধ্যে বুঝি কোনও শয়তানি শক্তি লুকানো আছে।

তবে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কোনও কারণ নেই। আমার দিক থেকে দেখলে ঘটনাটা লাভজনকও বটে। তাই আমি দ্বিরুক্তি না করে বলটা রেখেই দিলাম।

এখন রাত সাড়ে বারোটা। সকাল আটটা থেকে কাচের ঢাকনার বাইরে থেকে বলটার রং-পরিবর্তন স্টাডি করছি। সকালে মেটে, সবুজ, লাল, আর হলদে রঙের খেলা। দুপুরের দিকে লাল আর হলদেটে কমে আসে, সবুজটা আরেকটু গাঢ় হয়। বিকেলের দিকে সবুজটা ক্রমশ লাল আর কমলার দিকে যেতে থাকে। তারপর যত সন্ধ্যা হয়-সেটা হয়ে আসে টকটকে লাল-যেন বলটা একটা পাকা আপেল।

সন্ধ্যা সাতটা থেকেই লক্ষ করছি বলের সমস্ত রং চলে গিয়ে কেমন যেন একটা ছাই ছাই রুক্ষ ভাব নেয়। দশটা নাগাদ সেই ছাই রঙের উপর সাদার ছোপ পড়তে থাকে।

এখন বলটা একেবারে ধপধপে ঝকঝকে সাদা। তারপর তার উপর আমার দেড়শো পাওয়ার ইলেকট্রিক লাইট পড়েছে যেন তা থেকে জ্যোতি বিছুরিত হচ্ছে। কাচের ছাউনির ভেতরে একটা আবছা কুয়াশার মতো কী যেন জমা হচ্ছে বরফ থেকে বাষ্প বেরিয়ে যে রকম হয়। কতকটা সেইরকম।

কালকের দিনটাও এর রং-পরিবর্তন স্টাডি করে, পরশু বলটাকে আমার টেবিলের উপর ফেলে এর একটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করার ইচ্ছে।

১৪ই এপ্রিল

কাল সারারাত নিউটনটা কেঁদেছে। বলটা আনার পর থেকেই লক্ষ করছি তার মেজাজটা যেন কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে! কাল সারাদিনে অনেকবার দেখেছি সে একদৃষ্টি বিরক্তভাবে কাচের ঢাকনাটার দিকে চেয়ে আছে। কী কারণ কে জানে।

www.bengaliebook.com

ঘুমের অভাবেই বোধ হয়—আমার মাথাটাও কেমন জানি একটু ধরেছিল। তাই ল্যাবরেটরিতে যাবার আগে আমার তৈরি সেই বাড়ির একটা খেয়ে নিলাম। দুশো সাতত্তর রকমের ব্যারাম সারে আমার তৈরি এই অ্যানাইহিলিন ট্যাবলেটের গুণে।

আমার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে প্রথমে একটা জিনিস লক্ষ করলাম। কতগুলি কাচের বৈয়ামের মধ্যে আমার ছোট ছোট পোকামাকড়ের একটা সংগ্রহ ছিল-ইচ্ছে ছিল। মাইক্রোসোনোগ্রাফে তাদের ভাষা শুনে রেকর্ড করব। এখন দেখি প্রত্যেক বৈয়ামের প্রত্যেকটি পোকা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

এটা অবিশ্যি আমার ভুলেই হয়েছে। বলের এই মারাত্মক ক্ষমতার কথা জেনেও সেগুলোকে সরিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। কী আর করি। মরা পোকাগুলোকে ফেলে দিয়ে খালি বৈয়ামগুলো যথাস্থানে রেখে দিলাম।

এবার বলটার দিকে চেয়ে দেখি-গত কদিন সকালে যে রকম রং দেখেছি আজও ঠিক সেইরকম। রং বদলানোর নিয়মের কোনও পরিবর্তন নেই দেখে আশ্বস্ত হলাম। এ জিনিসটা বেনিয়মে বা খামখেয়ালি ভাবে হলে গবেষণার খুব মুশকিল হত।

কাচের ঢাকনার গায়ে বাষ্প জমে কাচের সবঙ্গে বিন্দু বিন্দু জলে ভরে গিয়েছিল। আমি তাই ঢাকনাটা তুলে সেটা পরিষ্কার করতে গেছি। এমন সময় ল্যাবরেটরির দরজার দিক থেকে একটা শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি, নিউটন দরজার চৌকাঠের উপর পিঠা উচিয়ে লেজ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার দৃষ্টি বলের দিকে।

নিউটন যে একটা লম্ফ দেওয়ার জোগাড় করছে সেটা আমি দেখেই বুঝেছিলাম, এবং আমি সেটার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম। লাফটা দিতেই আমি বিদ্যুদ্বেগে বলটার সামনে গিয়ে থপা করে দুহাতে বেড়ালটাকে ধরে নিলাম। তারপর তাকে ল্যাবরেটরির বাইরে বার করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

বাকি যেটুকু সময় ল্যাবরেটরিতে ছিলাম, দরজায় নিউটনের আঁচড়ের শব্দ পেয়েছি। সামান্য একটা মাটির বলের উপর বেড়ালের এ আক্রোশ ভারী রহস্যজনক।

আজ সারাদিন আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফ চালিয়ে নানান সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শব্দের চার্ট করেছি, আর সে সমস্ত শব্দই আমার টেপরেকডারে রেকর্ড করেছি! এই শব্দ সংগ্রহ শেষ হলে পর, শব্দের মানে করার পর্ব শুরু হবে। অবিনাশবাবু বলছিলেন বিজ্ঞানের নাকি একটা সীমা আছে। হায়রে! কত যে জানিবার বিষয় এখনও পড়ে আছে জগতে, অবিনাশবাবু তার কী বুঝবেন?

এখন রাত একটা। এবারে ঘুমোতে যাব। কিছুক্ষণ থেকেই যন্ত্রটার কথা ছেড়ে বার বার বলাটার কথা মনে হচ্ছে।

ওই যে রং পরিবর্তনের ব্যাপারটা-ওটার মধ্যে কীসের জানি একটা ইঙ্গিত রয়েছে। কীসের সঙ্গে যেন ওর একটা সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্যটা যেন আমার ধরতে পারা উচিত, কিন্তু আমি পারছি না। সাদা অবস্থায় বলটা যদি বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায়, তা হলে অন্য অবস্থাগুলো কী? সবুজ, লাল, হলদে, কমলা—এগুলো তা হলে কীসের রং? এই রং পরিবর্তনের কারণ কী? আমিই যদি না বুঝলাম তা হলে বুঝবে কে?

হয়তো কাল থেকে গবেষণার কাজ শুরু করলে ওর রহস্য ধরা পড়বে। হয়তো ব্যাপারটা আসলে অত্যন্ত সহজ। ক্রমাগত জটিল জিনিস নিয়ে মাথা ঘামালে, অনেক সময় সহজ সমস্যার সামনে পড়ে মানুষের কেমন জানি সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমার মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও এটা অসম্ভব নয়।

যাকগে। আজ আর ভাবিব না। কাল দেখা যাবে।

১৫ই এপ্রিল

আমার জীবনে যত বিচিত্র, বীভৎস, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটেছে, অন্য কোনও বৈজ্ঞানিকের জীবনে তেমন ঘটেছে কি? জানি না। এক এক সময় মনে হয়। আমি

সাহিত্যিক হলে এসব ঘটনা আরও সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারতাম। কিন্তু তার পরেই আবার মনে হয় যে অত গুছিয়ে লেখার দরকার কী?

আমি তো আর বানানো কাল্পনিক ঘটনা লিখছি না-আমি লিখছি ডায়রি। সোজা কথায় সরলভাবে আমার জীবনে যা ঘটেছে তাই লিখছি। সেখানে অত ভাষার ব্যবহারের প্রয়োজন আছে কি?

যাই হোক এবার যথাসম্ভব পরিষ্কার করে ঠাণ্ডা মাথায় এই কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনাটি লেখার চেষ্টা করা যাক।

কাল রাত্রে ডায়রি লেখা শেষ করে বিছানায় শুয়ে তারপর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আমি কাল লিখেছিলাম, যে এই রং বদলানোর মধ্যে বিশেষ যেন একটা ইঙ্গিত ছিল যেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে ওটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে একটা আলো দেখতে পেলাম। পরপর রঙের পরিবর্তনগুলো আর একবার ঝালিয়ে নিলাম মনের মধ্যে। মাঝরাত্তিরে বলটা সাদা তারপর সকালের দিকে ক্রমে সাদাটা চলে গিয়ে হলদে লাল সবুজ ইত্যাদি বেশ একটা জমকালো রঙের খেলা শুরু হয়। দুপুর যত এগিয়ে আসে তত সবুজটা গাঢ় হতে থাকে, হলদে লাল ইত্যাদি উজ্জ্বল রংগুলো কমে গিয়ে বলাটা ক্রমশ একটা গভীর অথচ স্নিগ্ধ চেহারা নেয়। তারপর বিকেলের দিকে সবুজ জায়গাগুলো আস্তে আস্তে লাল আর খয়েরি মেশানো একটা অবস্থায় পৌছে শেষ পর্যন্ত সন্ধের দিকে একটা ছাই ছাই ভাবে এবং রাত বাড়লে পর সাদার ছোপি ধরা শুরু।

কীসের সঙ্গে মিল এই পরিবর্তনের?

আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে—বৈঠকখানার দেয়ালের ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের উত্তরটা হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকের মতো আমার মাথায় এসে গেল।

আমাদের পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই বলের রং পরিবর্তনের আশ্চর্য মিল!

www.bengaliebook.com

তফাত কেবল এই যে, পৃথিবীতে যে পরিবর্তন ঘটতে এক বছর লাগছে-এই বলের সেটা ঘটতে লাগছে এক দিন, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা। রাত বারোটায় এই বলের চরম শীতের অবস্থা যখন এর সবটাই বরফের আবরণে ঢাকা। তারপর সেটা কমে গিয়ে সূযোদয়ের সময় থেকে লাল হলদে সবুজের খেলায় এর বসন্তকাল। সূর্য যতই মাথার উপরে উঠতে থাকে এই বল ততই গ্রীষ্মের দিকে এগোয় আর রঙের বাহারও কমে আসে। গ্রীষ্মের পর বিকেলের দিকে বর্ষা এলে বলটায় হাত দিলে ভিজে ভিজে ঠেকে। সূর্য্যন্তের সময় থেকে এর শরৎ; সন্ধ্যা বাড়লে প্রথম সাদার ছোপে হেমন্তকাল এবং সেই সাদা বেড়ে গিয়ে মাঝরাতে রাত বারোটাতে আবার চরম শীতের অবস্থা।

এই বলটি কি তা হলে আমাদের পৃথিবীরই একটা খুদে সংস্করণ? নাকি, এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রহ–সেখানে ঋতু পরিবর্তন আছে, প্রাণ আছে, প্রাণী আছে?

আমি জানি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসম্ভব বলে প্রায় কিছুই নেই–কিন্তু এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র গ্রহের কথা যে আমি পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

আমার চিন্তাধারা হয়তো অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলত–কিন্তু একটা অদ্ভূত শব্দের ফলে তার গতি ব্যাহত হল।

শব্দটা আসছে একতলা থেকে। সম্ভবত আমার ল্যাবরেটরি থেকেই।

নিউটন আজ আমার ঘরেই শুয়েছিল-সেও দেখি শব্দটা শুনেই কান খাড়া করে সোজা হয়ে উঠে বসেছে। ওর হাবভাব দেখে আমি ওকে কোলে তুলে নিলাম। তারপর ওকে নিয়ে একতলায় রওনা দিলাম। ল্যাবরেটরির উদ্দেশে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই শব্দটা আমার কানে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শঙ্কু! শঙ্কু! শঙ্কু!

www.bengaliebook.com

আমার নামটা ধরে কে যেন বারবার চিৎকার করে যাচ্ছে। উচ্চারণ স্পষ্ট হলেও, স্বর কিন্তু একেবারেই মানুষের স্বর নয়; কিংবা মানুষ হলেও আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে এমন কোনও মানুষের মতো নয়।

ল্যাবরেটরির দরজা খুলে ঢুকতেই শব্দটা যেন চারগুণ বেড়ে গেল। আর নিউটনের সে কী প্রচণ্ড আস্ফালন। কোনওরকমে তাকে বগলদাবা করে এগিয়ে গেলাম আমার টেবিলের দিকে। শব্দটা আসছে আমার যন্ত্রটা থেকে-বলের দিক থেকে নয়।

আমি এসে দাঁড়াতেই চিৎকারটা থেমে গেল। তারপর প্রায় আধামিনিট সব চুপচাপ। আমার বগলের তলায় বুঝতে পারলাম নিউটন থরথর করে কাঁপছে।

হঠাৎ আবার তীক্ষ্নস্বরে সেই চিৎকার শুরু হল।

টেরাটম! টেরাটম! টেরাটম গ্রহ থেকে বলছি!! কলির শঙ্কু! কলির শঙ্কু! তুমি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ?

আমি কী বলব? আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করাই যে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

আবার প্রশ্ন এল—শঙ্কু, আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমার মাইক্রোসোনোগ্রাফ যে ওয়েভলেংথে রয়েছে সেই ওয়েভলেংথেই আমরা কথা বলছি। শুনতে পাচ্ছ তো হ্যাঁ বলো—আরও কথা আছে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললাম, পাচ্ছি শুনতে। কী বলবে বলো।

উত্তর এল, আমরা তোমার ঘরে বন্দি। বুঝতে পারছি, তুমি না জেনে এ কাজ করেছ। কিন্তু করে অন্যায় করেছ। আমরা সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। কিন্তু তাতে তাচ্ছিল্য করার কোনও কারণ নেই; পৃথিবীর চেয়ে পাঁচ-লক্ষগুণ বড় গ্রহও সৌরজগতের বাইরে রয়েছে। আমাদের শক্তি আমাদের আয়তনে নয়। আমাদের শক্তি আমাদের বিজ্ঞানে, আমাদের বুদ্ধিতে। তোমাদের পৃথিবীর যা সম্পদ, সে অনুপাতে আমাদের টেরাটম গ্রহের সম্পদ

লক্ষ গুণ বেশি। আমরা কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। জলের মধ্যে পড়েছিলাম, তাই আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ আমরা মাটির নীচে বাস করি। কিন্তু তোমার এই কাচের আচ্ছাদন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ অক্সিজেন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের যেমন এ জিনিসটা দরকার, তেমনি আমাদেরও। এমনিতে মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাত সামান্যই, তবে আমাদের বুদ্ধি অনেকগুণে বেশি, আর আয়তন আমাদের এতই ছোট যে তোমাদের সাধারণ মাইক্রোস্কোপে আমাদের দেখা যাবে না। কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা থামল। আমি যে এরমধ্যে কখন চেয়ারে বসে পড়েছি তা নিজেই ঠাহর পাইনি। তারপর আবার কথা শুরু হল।

তোমার কাছে আমাদের অনুরোধ কাচের আচ্ছাদন খুলে ফেলো। আমাদের আয়ু এমনিতেই কমে এসেছে। একটা আস্ত গ্রহের সমস্ত অধিবাসীদের হত্যা করার অপরাধের ভার কি তুমি সারা জীবন বইতে পারবে? তাই অনুরোধ করছি—আমাদের মুক্তি দাও। তুমি বৈজ্ঞানিক। আমাদের সম্বন্ধে তোমার মনে কোনওরকম সহানুভূতির ভাব নেই?

একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে খোঁচা দিচ্ছিল। এবারে সেটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনও ক্ষমতা আছে যাতে তোমরা তোমাদের চেয়ে আয়তনে অনেক বড় প্রাণীকেও হত্যা করতে পার?

কিছুক্ষণ কোনও উত্তর নেই। আমি বললাম, আমার প্রশ্নের জবাব দাও। গত কদিনের মধ্যে তোমাদের কাছাকাছি কতগুলি প্রাণীর যে মৃত্যু হয়েছে—তার জন্য কি তোমরা দায়ী?

এবারে আমার প্রশ্নের উত্তরে একটা পালটা প্রশ্ন এল—ভাইরাস কাকে বলে জান?

নিশ্চয়ই।

কাকে বলে?

আমার ভারী অপমান বোধ হচ্ছিল, তাও উত্তর দিলাম–রোগবহনকারী বিষাক্ত বীজকে বলে ভাইরাস।

ঠিক। এই ভাইরাসের আয়তন কী?

মাইক্রোস্কোপে দেখতে হয়।

ঠিক। কিন্তু এই বীজ থেকে একটা গোটা শহরের লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে সেটা জান?

শুধু শহর কেন? একটা সম্পূর্ণ দেশের লোকসংখ্যা লোপ পেয়ে যেতে পারে। মহামারীর কথা কে না জানে?

ঠিক। এখনও কি বুঝতে পারিছ না। আমাদের ক্ষমতা কোথায়?

ছড়িয়ে দেব কেন?

তা হলে?

কোনও উত্তর নেই। আমি অনুভব করলাম আমার ভেতরের জামাটা ঘামে ভিজে উঠেছে। একটা সাংঘাতিক সন্দেহ মনের মধ্যে জেগে উঠেছে।

এই গ্রহের অধিবাসীরা কি তা হলে এক একটি মূর্তিমান ভাইরাস?

তাই যদি হয়, তা হলে এদের মুক্তি দিলে তো এরা সমস্ত পৃথিবীকে–তিন মাসের মধ্যে।

আমি চমকে উঠলাম। আমার কোন প্রশ্নের জবাব এরা দিচ্ছে? আমি তো কোনও প্রশ্ন করিনি। এদের!

এবারে একটা ক্ষীণ হাসির শব্দ পেলাম...সে হাসি এক অপার্থিব বিদ্রূপে ভরা। তারপর কথা এল...

আমরা মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। তুমি ভাবছ সমস্ত পৃথিবীকে রোগাচ্ছন্ন করার শক্তি আছে কি না আমাদের। আমি উত্তরে বলেছি...আছে। শুধু তাই নয়...সমস্ত পৃথিবীকে তিন মাসের মধ্যে আমরা জনশূন্য করে দিতে পারি। সংক্রামক রোগের জন্য তো আর হাঙ্গামা করতে হয় না। আমাদের একজনের চেষ্টাতেই সমস্ত গিরিডি শহরটা ফাঁকা করে দিতে পারি। আর সকলে মিলে যদি একজোটে লাগি তা হলে...।

গলার স্বরটা যেন কেমন ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেটা কি যন্ত্রের দোষ?

আবার উত্তর এল... না, তোমার যন্ত্র ঠিক আছে। আমরাই দুর্বল হয়ে পড়েছি। কাচের ঢাকনা না খুললে আমরা আর বাঁচব না। আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে তুমি-প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু; এই খুনের জন্য অবিশ্যি তোমাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না। কিন্তু বিবেক বলে কি তোমার কিছুই নেই। একজন বৈজ্ঞানিকের কি এতটা নিষ্ঠুরতা সম্ভব? ভেবে দেখো শঙ্কু, ভেবে দেখো।

তোমাদের যদি মুক্তি দিই, তা হলে পৃথিবীতে মানুষের উপর থেকে তোমাদের আক্রোশ যাবে কি? তোমাদের বিশ্বাস করব কী করে?

এ প্রশ্নের জবাব এল না। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর আমার যন্ত্রের ভিতর থেকে আসতে আরম্ভ করল এক বীভৎস আর্তনাদের কোরাস। কত কণ্ঠ সে কোরাসে মিলেছে। জানি না। কিন্তু সেটা যে আর্তনাদ, এবং তাতে যে তীব্র যন্ত্রণার ইঙ্গিত রয়েছে তাতে কোনও ভুল নেই!

শঙ্কু! শঙ্কু!

সমস্ত আর্তনাদ ছাপিয়ে আবার সেই কথা।

www.bengaliebook.com

শঙ্কু! শঙ্কু! শঙ্কু!

কী বলছি?

কাচের ঢাকনা খুলে দাও, খুলে দাও! আমরা মরতে চলেছি। আমাদের প্রাণ তোমার হাতে। হত্যার দায়ে পড়ো না। সারাটা জীবন বিবেকের জ্বালা...

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল।

আমি যেমন চেয়ারে বসেছিলাম, তেমনই বসে রইলাম। একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কর্তব্য কী সেটা বুঝতে পারছিলাম। কাচের ঢাকনা খোলা চলে না। টেরাটম গ্রহের প্রাণীদের বাঁচাতে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোকের জীবন বিপন্ন করা চলে না।

আমার মাইক্রোসোনোগ্রাফে শব্দ কমে আসছে। কথা থেমে গেছে-এখন কেবল তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ!

সে আর্তনাদ ক্রমশ হাহাকারে পরিণত হল।

তারপর সে হাহাকারও মিলিয়ে গিয়ে রইল এক গভীর নিস্তব্ধতা।

আমি আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করে আমার যন্ত্রের সুইচটা বন্ধ করে দিলাম।

তারপর আস্তে আস্তে বলটার কাছে হেঁটে গিয়ে কাচের ঢাকনাটা তুলে ফেললাম।

ঘড়িতে ভোর পাঁচটার ঘণ্টা বাজছে।

কিন্তু টেরাটমে বসন্তের রং ধরেনি। তার বদলে একটা যেন মেটে রুক্ষতা।

আমি বলটাকে তুলে নিয়ে নিউটনের দিকে চাইলাম। সে-ও দেখি একদৃষ্টে বলটার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু আগের সেই আক্রোশের কোনও ইঙ্গিত পেলাম না আর দৃষ্টিতে। আমি বললাম, তুই খেলবি বলটাকে নিয়ে? নে খেল।

বলাটা মাটিতে রাখতে নিউটন এগিয়ে এল। তারপর তার ডান হাত দিয়ে মৃদু একটা আঘাত করতেই সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ ফেটে চৌচির হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল!

সন্দেশ। বৈশাখ ১৩৭২

www.bengaliebook.com